রচনা

লেখকঃ শবরী ঘোষ

ডাক

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে অলোকেশ।

আপাতত, নিজের নয় অবশ্য। মধুদার। এবং আরো যথাযথভাবে বলতে গেলে, মৃতের ঠিক দুতলা নিচে দাঁড়িয়ে আছে ও। কেননা এই নার্সিংহোমের তেতলার কোনো এক বেডে শায়িত রয়েছে মধুদার নিষ্প্রাণ শরীর। আর অলোকেশ নিচে, ভিজিটার্স রুমের সামনে। মৃত্যুবিহ্বল।

আজ শেষরাতে তাঁর বুকে ব্যাথা শুরু হয়েছিল। যথারীতি ডাক্তার এবং নার্সিংহোম। তড়িঘড়ি চিকিৎসা। তবু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেকেন্ড অ্যাটাক। ভয়ঙ্কর মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভবিষ্যতের যাবতীয় সুখ ও অসুখ সম্ভাবনার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মধুদা।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ খবরটা পেয়েছিল অলোকেশ। খানিক পরেই সুমনাকে হাসপাতাল থেকে আনতে যাবে ও। গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে সুমনার। আজই রিলিজ করবে।

তবু এতটুকু ইতস্তত করেনি অলোকেশ। করার প্রশ্নই ওঠেনা। মানুষটা যে মধুদা! দ্রুত একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। এবং নার্সিংহোমে পৌছেই দেখেছিল, কমলদা রাণাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সদ্য পিতৃহারা রাণা!

মৃত্যু আসলে একটি পূর্ণচ্ছেদ। জীবনের, অন্যভাবে বললে, বর্তমানের উপর। এবং মৃত্যুর পরে কারোই আর কোন ভবিষ্যৎ থাকেনা। তাই মৃত্যুভয় বর্তমান থেকে ক্রমশ ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়ে চললেও, স্বয়ং মৃত্যু, সতত অতীতচারী। অতীতের স্থির কালো জলে ডুব দিয়ে বড় উথাল পাথাল করে সে। কোন আঁধার গহন খুঁজে তুলে নিয়ে আসে স্মৃত-বিস্মৃত কত চিত্রমালা; জীবনের জলছবি।

আপাতত যে ব্যক্তিগত আর্ট গ্যালারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে অলোকেশ, তার প্রায় প্রতিটি ছবিরই বিষয়বস্তু মধুদা। আর প্রায় সর্বত্রই কোথাও না কোথাও, সে নিজে। এবং ছবিগুলি বিগত বিশ বছর ধরে রচিত।

প্রথমে সদ্য এম. এ. পাশ করা অলোকেশ। ডিগ্রী আছে, চাকরি নেই। ঘরে "অন্নজলের হল ঘোর অনটন।" দেবদূত হয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন অল্প পরিচিত মধুদা। হাতে উজ্জ্বলন্ত মশাল! অর্থাৎ সম্ভাবনাময় একটি ভ্যাকেন্সির সংবাদ! দক্ষিণ কলকাতার একটি কলার তোলা স্কুলে পড়ান মধুদা। ওখানেই। প্রাইভেট স্কুল। অথরিটির সঙ্গে তাঁর জমজমাট rapport। মূলত মধুদার সুপারিশেই চাকরিটা হয়ে গিয়েছিল অলোকেশের। তাহলে তার নিজের মার্কশিটের কি কোন মূল্যই ছিলনা? কিংবা তার দেওয়া সেই স্মার্ট ইন্টারভিউটার? তা কেন? তবু, নাচুনে পুতুলের কেরামতির আড়ালে দক্ষ বাজিগরের হাতটির ভূমিকা অস্বীকার করবে কে?

জয়েন করার পর অলোকেশ বুঝেছিল প্রায় ঈশ্বরের মতনই সর্বশক্তিমান তাদের স্কুল অথরিটি। বুঝে সমঝে সব দিক সামলে চলার প্রয়োজনীয় পাঠ পড়াতেন মধুদাই। অলোকেশ কিছু গুবলেট করে ফেললে বকাঝকা করতেন, আবার সামলেও দিতেন ব্যাপারটা, এইভাবে দিনে দিনে আস্থা বেড়েছিল, গড়ে উঠেছিল চমৎকার একটি হৃদ্যতাও।

দোতলায় বিশাল স্টাফরুম তাদের। অনেকগুলি টেবিল। উত্তর কোণের টেবিলে বসতেন মধুদা। দক্ষিণে অলোকেশ। সমবয়সীদের সঙ্গে।

টিফিন পিরিয়ড। টিফিনবক্স খুলেছেন মধুদা। অলোকেশ চ্যাঁচাচ্ছে

—আজ মেনু কি মধুদা?

মধুদা উত্তর দিচ্ছেন, স্বভাবসিদ্ধ নিচু গলায়। অলোকেশ বলছে, কি? লুচি? বাঃ! তরকারিটা কি?... আলুভাজা? হাত নেড়ে না বলছেন মধুদা। কিছু একটা বলছেনও। শুনতে পাচ্ছে না অলোকেশ। কি? কুমড়োর ছক্কা? উঃ! একটু জোরে বলবে তো?

পাশ থেকে প্রদীপ তেড়ে উঠল — এই শালা, একদম চ্যাঁচাবি না তো! কানে তালা ধরিয়ে দিলে মাইরি!

অলোকেশ উঠে যাচ্ছে মধুদার টেবিলে। আসলে ওঁর টিফিনে কবে থেকে যেন ভাগ বসে গেছে অলোকেশের। একদম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। গিয়ে দেখল, লুচি আর নিউট্রিলার তরকারি। দেখেই বিরক্ত।

—এঃ! রাম রাম! সেই সয়াবীন বড়ি এনেছ? জানো না, সয়াবীন আমার যাচ্ছেতাই লাগে? কাল বউদিকে বলবে ডিমের কারি করে দিতে।...

দূর, আগে বলবে তো? তাহলে আর উঠে আসতান না শুধু শুধু।

—তোর মত এমন একখানা পেল্লায় গলা কি আমার আছে রে ভাই, যে এপাড়া থেকে ওপাড়া অবধি শোনা যাবে? হ্যাঁ, চাঁচাছোলা, বলিষ্ঠ এবং প্রয়োজনে অতি উচ্চগ্রামে বাধাঁ গলা একখানা আছে বটে অলোকেশের। উদ্দাম সেই গলার জন্য একই সঙ্গে বেশ খানিকটা অখ্যাতি এবং সুখ্যাতিও আছে বইকি তার। প্রায় নামডাকও বলা যেতে পারে। ধরো, স্কুলে কোনো পিরিয়ডে একই ফ্লোরে একাধিক ক্লাসরুম ফাঁকা যাচ্ছে হয়ত। টিচার আসেননি। অন্য কাউকে অ্যাসাইনমেন্টও দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই বাঁধা গরুগুলি ছাড়া পেয়েছে। খোঁটা উপড়ানোর উপক্রম। গুঞ্জন ক্রমশ হট্টগোলের চেহারা নিচ্ছে। পাশের ঘরগুলিতেও ক্লাস নেওয়া দুষ্কর। অনিবার্যভাবেই অলোকেশের ডাক পড়ত ভাইসপ্রিন্সিপালের ঘরে।

—সেভেন এল আর এইট জের রুমগুলোয় বড্ড গোলমাল হচ্ছে মি. রায়। আপনি একবার দেখবেন?

তা দেখত বইকি অলোকেশ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লাসগুলিতে একেবারে শ্মশানের নৈঃশব্দ নামিয়ে দিয়ে স্টাফরুমে ফিরত ও। অলোকেশের বিপুল ক্যারিশমায় হাসাহাসির ধুম পড়ে যেত সেখানে। হিন্দীর রামানুভব পান্ডে বলতেন

—আরে বাবা রে! আপনি অচানক চিল্লালে, কিসিকা ভি হার্ট অ্যাটাক হোতে পারবে, মিঃ রায়।

—উঁহু! আপত্তি জানাতেন কেমিস্ট্রির দেবাংশুদা। না হে না। আমার তো মনে হয়, অলোকেশ ঠিকমত চ্যাঁচালে মড়া পর্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে!

মাঝে মাঝে লজ্জিতই হত অলোকেশ। —কি করি বলুন তো? এমনিতে তো মোটামুটি আস্তেই বলি...। কি? বলি না? কিন্তু একটু জোরে বা চেঁচুয়ে কিছু বলতে গেলেই...

—তুই বরং এক কাজ কর অলোক। নন্দলাল ফুট কাটত। একটা বড় দেখে সাইলেন্সার কিনে ফেল। লরির। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেটা গলায় পরে নিবি। আমাদের ই. এন. টির খরচাগুলো অন্তত বাঁচবে। ... নাহলে বল, আমরাই নয় চাঁদাটাদা তুলে...। অপ্রস্তুত অলোকেশের এহেন হেনস্থায় মজা

জমে উঠত।

স্কুলের অনেকগুলি কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং অত্যন্ত সহৃদয় মানুষ বলে প্রয়োজনে মধুদার দ্বারস্থ হত সকলেই। যথাসাধ্য সাহায্যও করতেন তিনি। তবু অলোকেশের প্রতি বাড়তি একটু স্নেহ, প্রচ্ছন্ন একটু পক্ষপাতও চাপা থাকত না। ঠাট্টার ছলে মৃদু অনুযোগও করত কেউ কেউ। পরম গাম্ভীর্যে মধুদা বলতেন

—সাধে কি আর অলোককে একটু পটিয়ে-পাটিয়ে রাখি রে ভাই? আসলে, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" তবু ধরো যদি ফট করে মরে-টরে যাই কোনদিন, তখন অলোকেশই আমায় বাঁচাবে যে! স্রেফ "মধুদা মধুদা" করে এ্যায়সান হাঁক পাড়বে, যমরাজের পিলে পর্যন্ত চমকে যাবে! আর সে ব্যাটার হাত ফসকে আমার প্রাণটা অমনি ছুট্টে এসে সোজা ঢুকে পড়বে আমার মড়াটার ভেতর! বুঝলে না?

—উঃ! তুমিও আবার লেগ পুলিং শুরু করলে মধুদা? অলোকেশের অনুযোগ।

—আরে নাঃ! একে দাদা, তায় বয়সে বড়! তোর সঙ্গে ইয়ার্কি করতে পারি? যাক, সময়কালে কথাটা কিন্তু ভুলিস না ভাই। বেঘোরে মরে যেতে কিন্তু বড্ড দুঃখ পাব।... কি রে, মনে থাকবে তো তখন? মিটিমিটি হাসতেন মধুদা।

মধুদা ছিলেন। বিগত বিশ বছর ধরে অলোকেশের সুখে দুঃখে জড়িয়ে ছিলেন ভীষণভাবে। পরমাত্মীয়ের মত, অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও অভিভাবকের মত। সেই মধুদা আজ ক্লাসে নিছক স্মৃতিকথা মাত্র!

নন্দলাল আর অলোকেশ ভিজিটার্স রুমের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ গাছগুলির পাতায় পাতায় ঝলমল করছে সকালের রোদ। প্রকৃতি কারো মৃত্যুতে পরোয়া করেনা; অভিভূত হয়না কখনও। সে দায় মানুষের। শুকনো মুখে নন্দলাল বলে

—মধুদা তোকে কি বলতেন মনে পড়ে অলোক?

অন্যমনস্কভাবে সিগারেটে টান দিয়ে মাথা নাড়ে অলোকেশ। হ্যাঁ মনে পড়ে বইকি। খুবই মনে পড়ছে আজ। সারাক্ষণ। ঠাট্টা করেই যদিও, তবু

এতবার কথাটা বলেছেন মধুদা! এটা তো একটা চালু রসিকতাই হয়ে গেছিল তাদের স্টাফরুমে।

অনেকেই আসছেন ক্রমশ। মধুদার আত্মীয় স্বজনেরা, স্কুলের রাহুল অতনু বিজন, শ্যামলদা হারীৎদারা। সকলেই বিপর্যস্ত, ভারাক্রান্ত। মধুদারই কথা সকলের মুখে মুখে। বিজন কাঁদছে। প্রকাশ্যেই। হারীৎদা বললেন

—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন অলোকেশ? আজই তো রিলিজ করার কথা না?

সম্মতি জানাল ও। হারীৎদা ব্যাস্ত হয়ে উঠলেন।

—তাহলে তুমি আর দেরী কোর না অলোকেশ। ওঁকে আনতে যাবে তো মধুদার জন্য আর কিচ্ছুই তো করার নেই ভাই, তাছাড়া আমরা তো আছি এখানে। তুমি বরং এগোও এবার।

হারীৎদার কথাগুলি কাঁটার মত বিঁধছিল ওর ভিতরে। মধুদার জন্য সত্যিই কি কিছুই আর করার নেই কারো? এমন কি অলোকেশেরও না? হঠাৎ বিজন বলল

—মধুদা তোকে এত ভালবাসতেন, আর মধুদার শেষ কথাটুকু না রেখেই তুই চলে যাবি অলোক?

—কোন কথাটা? শ্যামলদা জিগ্যেস করলেন।

—মধুদার মৃত্যু হলে ওঁকে চেঁচিয়ে ডাকার কথা বলছে। খুব নিরাসক্ত গলা নন্দলালের।

—সেকী! হারীৎদা বলে উঠলেন। কি ছেলেমানুষী করছ বিজন। ওটা তো কথার কথা। ঠাট্টা। রসিকতা করে বলত মধু। মরা মানুষকে ডাকলে সে বেঁচে ওঠে? শুনেছ কখনও?

—নাই বা বাঁচল! তবু অলোক একবার ডাকুক না হারীৎদা? রুমালে চোখ মুছছিল বিজন। মিরাকল কি হয়না? বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না? আর নাই যদি হয়, তবু মধুদার শেষ অনুরোধটাই রাখুক অন্তত? মধুদার কথাগুলিকে তাঁর ‘শেষ অনুরোধ’ হিসাবে গুরুত্ব দিচ্ছিল বিজন।

—আঃ! পাগলামি কোর না বিজন। এত অযৌক্তিক হচ্ছ কেন? এরকম একটা নার্সিংহোমে দাঁড়িয়ে ওইসব খ্যাপামি করলে কি হবে জানো? ভ্রু কুঁচকে উঠেছিল হারীৎদার। অন্যরা সমর্থন করছিল তাঁকে।

ঘড়ি দেখল অলোকেশ। মৃত্যু মধুদাকে থামিয়ে দিলেও, সময় থেমে নেই। জীবিত মানুষের সময় সতত চলমান। মৃতের স্থির। জীবিত ও মৃতের অন্যতম পার্থক্য বুঝি এখানেই। বেলা হয়েছে। আর দেরী করলে হাসপাতাল ঝামেলা করবে। আজ আর সুমনাকে রিলিজই করবে না হয়ত। তা ছাড়া এতক্ষণে সুমনাও চিন্তা করছে নিশ্চয়ই।

মধুদার মৃত মুখটা দেখতে মন চাইছিল না। তবু যেতে হবে। যেতে হয়। এসময় বউদির কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ানো দরকার অন্তত। অগত্যাই পা বাড়াল ও। বিজন সঙ্গ নিল।

লিফটের মুখেই রাণা। ঝড়ে তছনছ হওয়া তরুণ বৃক্ষের মত। থমকে দাঁড়ালো ওকে দেখে। —অলোককাকু, বাবা তোমাকে খুঁজছিলেন।

—খুঁজছিলেন? কখন? কেন রে? কিছু বলেছেন না কি? হুড়মুড়িয়ে প্রশ্নগুলো করে ফেলল অলোকেশ।

—না। বেশী কিছু বলতে পারেননি তো। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু খবর দিতে বলেছিলেন তোমাকে। কাতর মুখখানা ফিরিয়ে নিল রাণা।খুবই অর্থপূর্ণভাবে অলোকেশের দিকে তাকাল বিজন।

ওকে কেন খুঁজছিলেন মধুদা? ওই বিপন্নতার মুহুর্তেও? মনের টানে? না কি মেডিক্লেম? অলোকেশের শালাই মধুদার মেডিক্লেম পলিসি করে। তাকে খবর দেবার জন্যই কি? না কি...

লিফটে উঠতে উঠতে বিজন বলল, দেখলি তো? আমি বলেছিলাম! আসলে বুঝতে পেরেছিলেন মধুদা। তাই তোকে...। অলোকেশ উত্তর দিল না।

তেতলার সচ্ছল কেবিন। মধুদা শুয়ে আছেন। বুক পর্যন্ত শাদা চাদরে ঢাকা। মুখে এখনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্নতাটুকু লেগে আছে। টকটকে গৌরবর্ণ মুখখানিতে যন্ত্রণার কালি লাগেনি এতটুকু। প্রশস্ত কপালে শাদা আলো ঝলকাচ্ছে। চোখদুটি বোজা। যেন ছুটির দিন বলে একটু বেশি বেলা অবধি ঘুমিয়ে নিচ্ছেন আজ! সুগঠিত ঠোঁটের প্রান্তদুটি তেমনি অল্প চাপা — যে গঠন তাঁর মুখখানিকে সারাজীবন ধরে মৃদু ও প্রসন্ন একটি হাসির মহিমা দান করেছিল।

পাশেই একটি টুলে বউদি বসে আছেন। চিত্রার্পিত। বিষাদপ্রতিমা। কন্যা

ঝুমা এবং মধুদার দিদি ছাড়াও ঘরে আরেকজন। মধুদার পায়ের কাছে দাঁড়াল অলোকেশ ও বিজন। অলোকেশের বুকের মধ্যে বাষ্প জমছে। জ্বালা করছে চোখদুটো।

সিস্টার এলেন। ঝকঝকে শাদা ইউনিফর্মে, দুরন্ত স্মার্টনেসে নার্সিংহোমটির মহার্ঘ আভিজাত্যের বিজ্ঞাপন। প্রোফেশনাল নিরাসক্তিতে, নিরুত্তাপ দায়িত্ববোধে একটি ঘোষণা করলেন তিনি। দৈববাণীপ্রায়! — এবার ঘর ফাঁকা করে দিতে হবে। ওঁদের কিছু কর্তব্যকর্ম এবং নিয়মকানুন আছে, সেগুলি হয়ে গেলেই 'বডি' ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হবে আত্মীয়দের। সুতরাং — 'প্লিজ, বাইরে যান আপনারা, প্লিজ...'

মধুদার মৃত্যুর ব্যাপারটা এতক্ষণে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যেন। জীবিতের ব্যক্তিপরিচয় ঘুচে গিয়ে শুধুই একটা 'বডি' হয়ে গেছেন মধুদা। স্রেফ একটা 'ডেডবডি'! নিঃশব্দে কেঁদে উঠল ঝুমা। বউদি চোখে আঁচল চেপেছেন।

ভিজে ঠান্ডা হাতে অলোকেশের হাত চেপে ধরল বিজন। ফিসফিসিয়ে বলল — ডাক?

কি করবে, কিচ্ছু বঝতে পারছে না অলোকেশ। ডাকবে? ডাকা উচিৎ? প্রাণপণে একবার পরলোক পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবে তার কণ্ঠস্বর? তার আহ্বান? কিন্তু মৃত্যুর পরে অবিনশ্বর আত্মা বলে সত্যিই কি কিছু থাকে কোথাও? ধর্মগ্রন্থের বাণীটানি যাইই বলুক, আত্মার অবিনাশী অস্তিত্বের প্রমাণ আছে কোনো? আছে?... আর আত্মা যদিই থাকে, সে কি শোনে? কর্ণপাত করে প্রিয়জনের আকুল আহ্বানে? ফিরে আসে? ফেরে? কদাচ? কখনও?

কিন্তু আত্মা থাক বা না থাক, মিরাক্‌ল ঘটুক বা না ঘটুক, অতি অসহায় একটা আর্তনাদ মাথা কুটছে অলোকের বুকের ভিতরে। তীব্র আকুল একটা ডাক আপনিই ওর গলা ফাটিয়ে বেরিয়ে আস্তে চাইছে — মধুদাআআ...!

ঘরের মধ্যে সন্ত্রস্ত চোখ বোলাল অলোকেশ। ঝাঁ চকচকে দেওয়াল। দামী পর্দা। চিকিৎসার সরঞ্জাম; ভারিক্কি, অচেনা। এ. সি. চালানো ঘরে কি বিচ্ছিরি একটা শীতলতা! মধুদার সবচেয়ে আপনজনের বেদনাও কি নিরুচ্ছ্বাস! কান্না কি শব্দহীন! মৃত্যুর রহস্যময় গম্ভীর মহিমা, অথবা নার্সিংহোমটির উচ্চকোটির আভিজাত্যের কারণেই বা হয়ত বা, কেমন একটা

বুকচাপা থমথমে ভাব চারিদিকে।

অলোকের উন্মাদ ডাক খুব বেখাপ্পা শোনাবে না এইখানে? পরিজনদের ব্যাথাহত স্তব্ধতার পাশে খুবই বাড়াবাড়ি রকমের আদিখ্যেতা বলে মনে হবে না? সর্বোপরি, অমার্জনীয় অপরাধও নিশ্চয়ই? নার্সিংহোমের লোকজন ছুটে আসবে। তিরস্কার ও অপমান! প্রকারান্তরে ঘাড়ধাক্কা। বউদিদেরও হয়ত অপমানিত হতে হবে ওর জন্য। ঢোঁক গিলল অলোকেশ। গলার কাছটায় ব্যাথা লাগছে।

সিস্টার এসেছেন ফের। এবার সঙ্গে, গলায় স্টেথো ঝোলানো চোখা এক ইয়াং ডাক্তার। কি হাই-ফাই কেতা তাঁর! একটিও কথা বলছেন না। শুধু ভুরু অল্প তুলে, চোখে একটা বিস্ময়চিহ্ন লটকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন! এবং সেই নির্বাক উপস্থিতিরই কি সোচ্চার অনুশাসন!

ঘর ছেড়ে একে একে চলে যাচ্ছেন শোকসন্তপ্ত প্রিয়জনেরা। এমন কি বিজনও! ইতস্তত করছে শুধু অলোকেশ। এত করেছেন মধুদা ওর জন্য। কিন্তু মধুদার প্রতি শেষ কর্তব্যটুকু কি বাকি থেকে যাচ্ছে ওর? সারা জীবনের মত? অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে কিছু?

ও কি তাহলে পরে কেওড়াতলায় যাবে একবার? সেখানে তো এত অনুশাসন থাকবেনা। কিন্তু এখন হাসপাতালে গিয়ে, সুমনাকে রিলিজ করিয়ে, হাওড়া শালকিয়ার বাড়িতে রেখে, ফের শ্মশানে ফিরে আসতে আসতে বড্ড বেশী দেরী হয়ে যাবে না কি? খুবই সম্ভবত, মধুদার নশ্বর দেহটার আর কোন পার্থিব অস্তিত্বই থাকবে না ততক্ষণে। সুতরাং মধুদাকে শেষ ডাকটুকু ডাকার জন্য এই তার শেষ সুযোগ। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে... আহা, হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ...

ডাক্তারটি তাকালেন ওর দিকে। স্থির। নির্বাক ও বাঙ্ময়। মধুদাকে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে অলোকেশ। ওঃ! ঠোঁট টিপে কি অদ্ভুত হাসছেন মধুদা! হাসছেন!

মাথাটা ভারী হয়ে নুয়ে পড়ছে ক্রমশ। পাথরের থামের মত পা দুটো টেনে টেনে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে অলোকেশ। বোবায় ধরেছে তাকে।

বর্তমান পিছলে গড়িয়ে যাচ্ছে অতীতের অন্তহীন গহ্বরের দিকে...